নামমাত্র

অমিতাভ চৌধুরী



নামমাত্র

অমিতাভ চৌধুরী

*

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৯৪

প্রকাশক ঃ
সি. ভট্টাচার্য
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫, অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা
অমল চক্রবর্তী

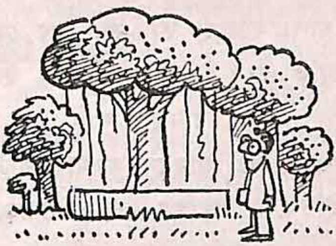
প্রচ্ছদ ঃ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

দাম মাত্র দশ টাকা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্যামদুলাল কুণ্ডু
প্রীতিভাজনেষু

সাফাই

গান গাইতে পারি না, হেঁড়ে
গলা। আবৃত্তি করতে পারি না,
উচ্চারণ খারাপ। খেলাধুলা ?
নামমাত্র। সহশিক্ষার মক্কা শান্তিনিকেতনে
এসে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেলাম অন্য
ছেলেদের কাছে। নজরে পড়ার সুযোগ



হল আচমকা। 'বৃহস্পতি' নামে হাতে লেখা
কাগজ বের করে শুভময় ঘোষ,
সুবীর সেন ও বিশ্বজিৎ রায়।
তাতে একটা কার্টুন এঁকে দেয় আমার রুমমেট
সুলতান আলম। শুভময়ের মনে হ'ল,



কার্টুনের ক্যাপশন হিসেবে একটা ছড়া দিলে ভাল হয়। হস্টেলে আমারই ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ওরা কেউ পারছে না দেখে এগিয়ে এলাম এবং একটা ছড়াও হাত থেকে বেরিয়ে গেল, যা ভাল লাগল সকলের। ব্যস, তারপর ফরমাশের পর ফরমাশ। রাতারাতি ছড়াদার হয়ে গেলাম। সে ১৯৪৪ সালের কথা।

তারপর অজস্র ছড়া লিখে চলেছি। সব যে ছাপা হয়েছে, তা নয়, সব যে আমার মনে আছে, তা'ও নয়; কিন্তু মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারি, এই অপবাদ রটে যাওয়ার পর আমাকে ফরমাশ খাটতে হচ্ছে সব সময়। ইতিমধ্যে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে একদিনের আনন্দবাজারে একটা ছড়ার দোকান দিয়েছিলাম বলে ছড়া



আমার পেছনে আরও লেগে গেল। সেই দোকানে আমার খদ্দের ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি,

শান্তিদেব ঘোষ, সুপ্রভা মুখার্জি (গিলিদি), অনিলকুমার চন্দ, রানি চন্দ প্রমুখ সত্তর আশি জন।

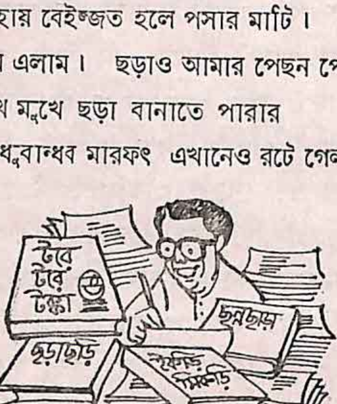
ওই দোকানের সামনে বসে খদ্দের জোগাড় করত একালের দুই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও মৃণাল দত্তচৌধুরী এবং পেছনে পর্দাঢাকা ঘরে বসে আমি ফরমাশ মতো নামে নামে ছড়া লিখে দিতাম। রেট অর্ডিনারি চার আনা, স্পেশাল আট আনা।

অনিলদা, অর্থাৎ অনিলকুমার চন্দ হলেন আমার ছড়ার বড় সমঝদার। এক্সকার্সনে বা পিকনিকে গেলেই গান নাচের সঙ্গে ফরমাশ মাফিক ছড়া বানাতে হত আমাকে। একবার ভুবনেশ্বর এক্সকার্সনে বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি আশরাফ সিদ্দিকির সঙ্গে আমাকে কবির লড়াই করতে হয়েছিল অনিলদার অনুরোধে। ডেহরি অনশোন এক্সকার্সনে অনিলদা কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক সম্পর্কে গোপনে আমাকে কতকগুলো অ্যাটাকিং পয়েন্ট দিতেন, যা দিয়ে পরে ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে ছড়া বানাতাম ও হাততালি কুড়োতাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর অনিলদা আমাকে আর তাঁর ছেলে অভিজিতকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কনস্টিটুয়েন্সির বিভিন্ন এলাকায়। যে বাড়িতে আমরা অতিথি হতাম, সেই বাড়ির গৃহকর্তা সম্পর্কে অনিলদার ফরমাশে আমাকে একটি করে ছড়া লিখতে হত। পরে আমার আতঙ্ক হয়ে গেল। নতুন কোন বাড়িতে যাবার মুখে

ভাবতাম, না জানি কী পদবী ভদ্রলোকের, পদবীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাবো তো? শুধু ছন্দ আর মিল নয়, মার্জিত পরিহাসও চাই।

সেবারের সেই বিপদেও পার পেয়ে গেলাম। আমাকে তখন আর পায় কে, 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে' নাচার অবস্থা। প্রচণ্ড চাহিদা আমার শান্তিনিকেতনে। কোন আসর বসলেই "এবার অমিত ছড়া বানাক' কিংবা 'অমিতদা তাহলে ছড়া বলুন'—এই ধরনের অনুরোধে আমি যুগপৎ আতঙ্কিত ও পুলকিত হ'তাম। পুলকের কারণ বুঝতে অসুবিধে নেই, আতঙ্কের কারণ ছড়া বানাতে গিয়ে ফেল করলে প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি। তবে পরে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, কোন পিকনিক এক্সকার্সন বা কোন ঘরোয়া আসরে যাবার আগে আমি একটু প্রস্তুত হয়ে যেতাম। অপ্রস্তুত অবস্থায় বেইজ্জত হলে পসার মাটি।

কলকাতায় এলাম। ছড়াও আমার পেছন পেছন এল। মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারার দুর্নাম বন্ধুবান্ধব মারফৎ এখানেও রটে গেল।



শান্তিনিকেতন থাকতে বেরিয়েছিল দু'খানা ছড়ার বই—টরে টরে টক্কা ও ছড়াছড়ি, কলকাতায় ঘটা করে বেরোল ইকড়ি মিকড়ি, তারপর ছন্নছড়া। বিভিন্ন কাগজ থেকে ফরমাশেরও শেষ নেই। হঠাৎ একদিন দেখি আমি ছড়াদার হয়ে বসে আছি।



যুগান্তরের পাতায় আমার লেখা রোজনামতা-র সব আদি ছড়া ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিল ছড়াকে। টেলিভিশনে বাংলা নববর্ষের আসরে ছড়া দিয়ে যোগদানকারী সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় চাহিদা গেল আরও বেড়ে।



আমি যাই বঙ্গে ছড়া যায় সঙ্গে। নইলে
সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা হীরক রাজার দেশের
সমালোচনা করতে যাব কেন
ছড়ায় ?
চুপি চুপি বলি, বিভিন্ন জায়গায় চটজলদি
ছড়া বানাতে হয় নিশ্চয়ই, তবে
মাঝে মাঝে ছড়ার ফরমাশ আসতে পারে ভেবে
আগে ভাগে একটু তৈরি হয়ে যাই।
ফরমাশ আসেও। এবং ভাব দেখাই যেন
পুরোটা এইমাত্র বানালাম। কী বিপদ
বলুন তো। অধিকাংশ ছড়াই নাম
দিয়ে। বসু মিত্র দাস ঘোষ পদবী নিয়ে
ঝামেলা নেই, চটপট মিল আসে, কিন্তু
এমন সব বেমিল নাম ও পদবী থাকে
আমাকে হিমসিম খেতে হয়। এখন কোন অনুষ্ঠানে
রওনা হবার আগে হৃদকম্প হয়,
পাছে ছড়া বানাতে বলে। এই যেমন
মহাজাতি সদনে গিয়েছিলাম জুনিয়র পি. সি.



সরকারের ম্যাজিক দেখতে। শেষ হওয়ার পর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও সন্তোষকুমার ঘোষের প্রদীপ সম্পর্কে স্তুতিবাক্য বলার পর হঠাৎ মাইকে ঘোষণা 'অমিতাভ চৌধুরী মঞ্চে আসুন।' অ্যাইরে, সেরেছে, বোধহয় ছড়া বলতে হবে। ঠিক তাই। প্রদীপেরই অনুরোধ, 'আমার সম্পর্কে একটা ছড়া চাই।' ছড়া বানাতেও হল। মার্বেল প্যালেসে হবে বাবু-আড্ডা। বড় বাবুমশায় রবিশঙ্কর। আমিও অন্যতম বাবু। জানতাম, ওখানেও



ছড়া বলতে হবে। রবিশঙ্কর নিয়ে বললামও; কিন্তু জানা ছিল না, রবিশঙ্করও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমার ছড়া বলা শেষ হওয়া মাত্র তিনি আমাকে নিয়ে লেখা তাঁর ছড়া পড়ে শুনিয়ে বাজিমাৎ করলেন। আমাকে নিয়ে প্রথম ছড়া বানিয়েছিলেন অবশ্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। হঠাৎ একদিন ডাকে চিঠি এল। চিঠির ভেতর ছড়া। তারপর গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

এখন ডাকে প্রায়ই ওই রকম ছড়া পাই। সব জমিয়ে রেখেছি। ছাপতে লজ্জা করে, যদি লোকে দেমাকি ভাবে। আসল কথা হল কী জানেন, অবসর সময়ে আমি নিজেকে নিয়েও ছড়া কাটি। নিজেই তো সবচেয়ে বেশি পরিহাসের বিষয়।

তাই আমি বলি—

কেউ কাটে খাল, কেউ কাটে তাল।
কেউ কাটে কাঠ, কেউ কাটে গাঁট।
কেউ কাটে জাব, কেউ কাটে ডাব।
কেউ কাটে মড়া, আমি কাটি ছড়া।

আমি জানি, অন্নদাশঙ্করের মতো ছড়া আমি লিখতে পারিনা। খাপছাড়া আবোল তাবোল দূরে যাক, প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিমল রায় অজিত দত্ত গুরুসদয় দত্ত প্রমথ চৌধুরী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দ্রহাস)



প্রমুখ মান্যজনের লেখা ছড়ার ধারে কাছে আমি নেই। শুধু একটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছি বহুদিনের অভ্যেসে। যখন তখন যাঁকে তাঁকে নিয়ে ছড়া কাটতে পারি, সেকালের কবিওলা বা তর্জাওয়ালাদের মতো। গেল শতাব্দীতে জন্মালে আমি বোধহয় তাই হতুম। গুরু হতেন ঈশ্বর গুপ্ত। কবিতার ছবি তো আঁকতে পারলাম না, তাই ছবির কার্টুন এঁকেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। ছড়া কার্টুন ছাড়া আর কী! আমার অধিকাংশ ছড়াই তাৎক্ষণিক ও সাময়িক, অল্প কয়েকটি টিকে থাকতে পারে। যখন দেখি কে লিখেছে না জেনে আমারই লেখা ছড়া অন্য কেউ আমাকে শোনায়, তখন ভাবি, এই তো ঠিক হয়েছে। ছেলে ভুলানো যে সব ছড়া আমরা শৈশবে শুনেছি, তার রচয়িতার নামও তো আমরা জানিনা। এই ছড়ার বইয়ে সাজিয়েছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে (জীবিত ও মৃত) নিয়ে লেখা গোটা ষাটেক ছড়া। এ রকম আরও অনেক ছড়া হারিয়ে গেছে। লিখে রাখিনি। মনে রাখিনি। ছাপাও হয়নি। বিভিন্ন আড্ডায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং টেলিভিশনের আসরে যে সব ছড়া কেটেছি, তার থেকে বাছাই করেই এই সংকলন। পরিহাস বা শ্লেষ যদি কোন ছড়ায় থেকে থাকে তাহলে তা ছড়ার মজার খাতিরে, অন্য কোন কুমতলবে নয়। সংকলনে সাহিত্যিক, গায়ক,

খেলোয়াড়, অভিনেত্রী, রাজনীতিবিদ—
নানা শ্রেণীর লোক আছেন। এমনকি 'গোলে-হরিবোল' হয়ে শেষের ছড়ায় আমি নিজেও ঢুকে পড়েছি। এই সব ছড়ার কিছু কিছু অনেক কাগজে আগেই ছাপা হয়েছে, বেশ কিছু ছাপা হয়নি।
ছড়ার সঙ্গে চাই ছবি। ছবি এঁকেছেন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট অমল চক্রবর্তী। তাঁকে ধন্যবাদ।
আর ধন্যবাদ আগ্রহী প্রকাশক পীযূষ রায় ও তাঁর বন্ধু (আমারও) সুনির্মল রায়কে। বইয়ের নাম যাই হোক, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা 'নামমাত্র' নয়।

অমিতাভ চৌধুরী



পুনশ্চ ॥ একটা ভুল হয়ে গেল। পুরো ভূমিকাটা ছড়ায় লিখলে বেশ হতো। তাই না?

।। এঁরা পর পর আছেন ।।

নামমাত্র



যদি থাকতেন বুদ্ধ
আমরা কি আর চোখ রাঙাতাম
হতাম ভীষণ ক্রুদ্ধ?
যদি থাকতেন বুদ্ধ
হত কি আর কাটাকাটি
মারামারি, যুদ্ধ?
যদি থাকতেন বুদ্ধ
মৈত্রী এবং করুণাতে
ভাসত জগতসুদ্ধ।
যদি থাকতেন বুদ্ধ,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ছেড়ে
জীবন পরিশুদ্ধ।

বুদ্ধদেব

এক যে আছেন রবিঠাকুর
বৈশাখেতে আসেন,
একটি দিনের জন্যে তাঁকে
সবাই ভালবাসেন।

ফুলের মালা গানের ডালা
একটু নাচানাচি,
ধূপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজিয়ে
আসি কাছাকাছি।

বৈশাখ মাস পেরিয়ে গেলে
আবার যে-কে-সেই,
রবিঠাকুর কোথায় গেলেন ?
ধারে কাছে নেই।

আমরা আবার লাইনে দাঁড়াই
হিন্দি সিনেমায়
রবিঠাকুর কেমন ঠাকুর
ভুল যে হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ





গান্ধী রাজার বড় তেজ,
তাড়িয়ে দেন ইংরেজ
বলেন 'বন্দেমাতরম্'
সাহেবের মাথা গরম।

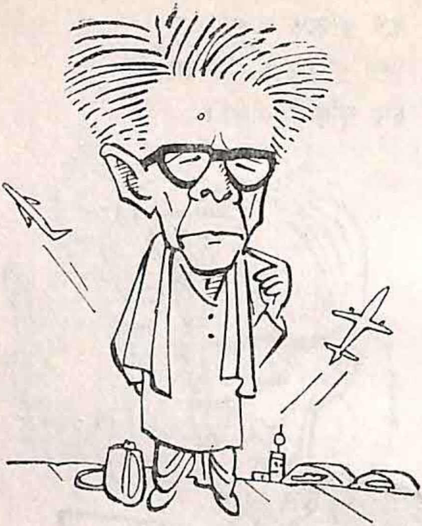
মহাত্মা গান্ধী

এক কুড়িতে যেমন তেমন
দ্বই কুড়িতে তাজা,
তিন কুড়িতে চাকরি ছাড়েন
চার কুড়িতে রাজা।



রাজামশাই গলপ লেখেন
লেখেন উপন্যাস,
আসলেতে ছড়ার রাজা
ছড়ার বেদব্যাস।

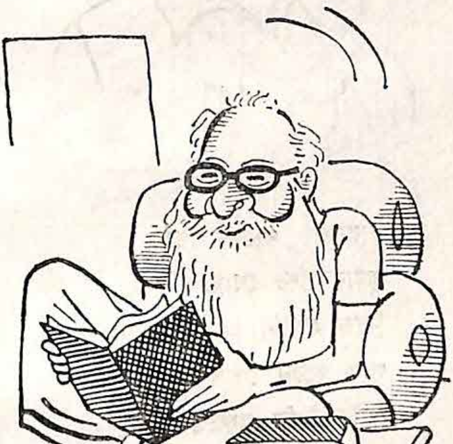
অন্নদাশঙ্কর রায়



আশী বছর পার করেও
যুবা প্রেমেন মিত্র
বিধাতা কন—'আরও কুড়ি
জিৎ রো বেটা, জিৎ রো।'
চোখে শুধু পড়ল ছানি
চিনতে ভোলেন, তাও জানি
দমদমেতে নেমে বলেন—
'এলাম আমি হিথরো ?'

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সত্তর নিম্নে বনং ব্রজেৎ
সত্ত্বর উর্ধ্বে ভোগং,
লেখাং পড়াং সঙ্গে শব্দং
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যোগং।
কিন্তু নিশ্চয় ত্যাগ না কুরুং
ছন্দং নামং রোগং।



প্রবোধচন্দ্র সেন



বারাসতে থাকেন তিনি
তুষারকান্তি ঘোষ,
নিজে হাসেন অন্যে হাসান
গল্প করেন খোস।
জানি তিনি কৃষ্ণভক্ত
আঁৎকে ওঠেন দেখে রক্ত,
তুলসিপাতা দিয়ে মুরগি
খেতে নেইকো দোষ।

তুষারকান্তি ঘোষ



থাকেন এ শহরে
মনটা যশোহরে।

মনোজ বসু.



সই লো সই, পেলাম সই
সঙ্গে পেলাম কী
সঙ্গে পেলাম পাঁচ আঙুল
সেটাই চুষেছি।

পাঁচ আঙুল পাঁচ পাঁপড়ি
মেলে রেখেছে,
মকবুলবুল ফিদা হোসেন
ছবি এঁকেছে।

সই লো সই, তোমায় কই
এই বাবুটি কে,
বৈদ্য তো নন, তবুও সেন,
হু-সেনবাবু সে।

আবু হুসেন বাবু হুসেন
সইয়ের বড় দাম,
অনেক ছবি এলেবেলে
না থাকলে তাঁর নাম।

মকবুল ফিদা হুসেন



ছিলেন রবি ঠাকুর-রবি, এখন অস্তমিত,
আছেন রবি শঙ্কর-রবি, অত্র উপনীত।

পশ্চিমেতে একটু হেলে তিনি মধ্যাকাশে,
বঙ্গবাসী বিশ্ববাসী তাঁকে ভালোবাসে।

রূপে কার্তিক গুণে গণেশ ওষ্ঠে মিষ্ট হাসি,
রমণীকুল বড় আকুহাসি সর্বনাশী।

ধন্য ধন্য হে রবীন্দ্র কিন্নরলোকে রাজা,
ষষ্ঠিবর্ষ অতিক্রমি নব্যযুবা তাজা।

যন্ত্র দিয়ে মন্ত্রধ্বনি ঝংকারে ঝংকারে,
ডারাডিরি ডারাডারা মেজরাফে ও তারে।

কখন তিনি কোথায় থাকেন ঠিক-ঠিকানা নাঞি,
আজ টোকিও কাল শিকাগো পরশু মস্কো পাঞি।

হিল্লি-দিল্লি করে যখন মনে ক্লান্তি নামে,
শান্তি পেতে লম্বা পায়ে আসেন কাশীধামে।

নসরৎপুরের বাবুর নাতি অদ্য নিজে বাবু,
জলসাঘরের এ বৈঠকে বলেন —'আমি বাবু'।

সেই বাবুকে হেথা পাঞা জানাই শ্রদ্ধা প্রীতি,
কালচক্র পশ্চাতে যায়, ঊনবিংশে স্থিতি।

জুড়ি গাড়ি, তালের পাখা, গোলাপ জলের বাস,
এলাচেরও খুশবু আছে—পুরনারীর আশ।

গোছা গোছা ধুতির কোচা লোটে ভূমিতলে,
বালুচরী পিনা বিবি বাবুর সঙ্গে চলে।
গানের সঙ্গে গল্পগুজব করে গুণিজনে,
রবিমঙ্গল সমাপ্ত হয়, অমিতাভ ভণে।

রবিশঙ্কর

এপার বাংলা ওপার বাংলা
মধ্যিখানে চর



তার মধ্যে বসে আছেন
শেখ মুজিবর।

শেখ মুজিবর রহমান

উপীনবাবুর নাতি তিনি
তাতাবাবুর ছেলে,
রায়বাড়িতে মাণিক জ্বলে
কোটিতে এক মেলে।



ক্যামেরাতে জগৎ দেখেন
ছবি আঁকেন গল্প লেখেন,
ফেলুদাকে ফেলতে নারাজ
সৃষ্টি চিরকেলে।

সত্যজিৎ রায়

অনেক আগে যেমন ছিলেন
আজও আছেন তেমন তো,
বাংলাদেশের মনের মানুষ
গানের রাজা হেমন্ত।

হাত গোটানো শার্ট ও ধুতি
একই রকম বসন তো,
হেমন্ত নাম হলে কী হয়
কণ্ঠে চিরবসন্ত।



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়



শান্তিকেতন থেকে এলো
শান্তিদেবের নাচ,
কালোপাথর খোদাই করা
ভাস্কর্যের ছাঁচ।
ডাইনে ঘোরেন বাঁয়ে ঘোরেন
লম্ফ দিয়ে পায়ে ঘোরেন
মণিপুরীর সঙ্গে থাকে
কথাকলির 'টাচ',
শান্তিকেতন থেকে এলো
শান্তিদেবের নাচ।

শান্তিদেব ঘোষ



ক্ষিতিমোহন পণ্ডিত,
পণ্ডিত, না PUN-ডিত ?
উপাসনা কার্য,
মন্দিরে আচার্য,
ভাষণ রসে মণ্ডিৎ।

ক্ষিতিমোহন সেন

সকল কথায় যখন তখন
রসিকতা আনেন টানি,



মন্ত্রী ছিলেন, রাজা তো নন—
তবু তাঁহার আছেন 'রানী',
কবি বলতেন বাঙাল তাঁকে
সেই কথাটা আমরা জানি।

অনিলকুমার চন্দ



চুরুট ফুঁকো
সুভাষ মুখো
মস্ত বড় কবি,
কেশর ফোলা,
স্কন্ধে ঝোলা
তরুণ দলের নবী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়



বসু সমরেশ
লিখছেন বেশ।
ক্রমে ক্রমে ক্রমে
বয়সটা কমে
কালো হয় কেশ।

সমরেশ বসু



এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ
দুই কবি দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
নন্দী কবি গুপ্ত কবি কবি চক্রবর্তী
নানারকম পদবীতে কবিসমাজ ভর্তি।
কিন্তু সবার চাইতে কবি চট্টো এবং গঙ্গো।
এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ
দুই মানিক দেখাত পার যাব তোমার সঙ্গ।
পদ্যে আছেন গদ্যে আছেন আছেন সবার মধ্যে
ঘুরতে পারেন উড়তে পারেন ডুবতে পারেন মদ্যে।
জোড়-মানিকের শিরোমণি চট্টো এবং গঙ্গো।
এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ
দুই প্রতিভা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ
এক প্রতিভা সোনার মাছি খুন করে রোজ যান
আর একজনা নীরার জন্যে দিতে পারেন প্রাণ।
বাঙাল-ঘটি যুগলবন্দি চট্টো এবং গঙ্গো।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



এইযে বাবু সুনীলবাবু
কৃত্তিবাসের ছা,
দিনে লেখেন রাত্রে লেখেন
কলম থামে না।
নীরার জন্যে পদ্য লেখেন
নারীর জন্যে গদ্য লেখেন
আড্ডা মারেন গল্প করেন
ভিজলে গলা গানও ধরেন
আজও তিনি তরুণ আছেন
পঞ্চাশেতে পা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবার চেয়ে শক্তিমান
চাটুজ্জে সে শক্তি,
মাঝে মাঝে বেসামাল,
পথে রক্তারক্তি।



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

গলা দিয়েছেন বিধি,
রবির গানের নিধি—
আমাদের সুচিত্রাদিদি।



সুচিত্রা মিত্র



ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকেন
মাথাগরম বাবু,
অফিসে খান চপ কাটলেট
বাড়িতে দুধ সাবু।
তড়পে বেড়ান দিনের বেলা
রাত্রে যখন বাড়ি গেলা
ঘর থমথম গা ছমছম
ভূতের ভয়ে কাবু।

সন্তোষকুমার ঘোষ

ফ্রেমে বাঁধা ঠোঁটের হাসি
মধুর মিহি সম্ভাষণ,
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি. সি. লাহার বিজ্ঞাপন।



সুপ্রভা মুখার্জি

বিষ্ণু দে—
তিনি কে?
কবি যে।



বিষ্ণু দে



'মোহর' তিনি আকবরী
গলায় সোনা লাখ ভরি।
এমন মধুর ধ্বনি কার ?
কণিকার কণিকার।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়



বিত্তহীনের দেশে তিনি
ছিলেন বিত্তমন্ত্রী,
ইন্দিরাজী আসল যন্ত্র
তিনি ছিলেন যন্ত্রী।
কালো টাকা ধরতে তিনি
জানেন অনেক ক্রাফ্‌ট
একটু এদিক-সেদিক হলে
বন্ধ ওভারড্রাফট।

প্রণব মুখোপাধ্যায়



রুমানিয়া বাড়ি নয়
রুমা নাম তবু,
নাচ-গান অভিনয়ে
পিছপা না কভু।
বাড়িতে আছেন তাঁর
গুণী এক প্রভু—
পত্নীর নামডাকে
তিনি জবুথবু।

রুমা গুহঠাকুরতা

আলি আকবর খান
একটু না ভড়কান
হাতে নিলে সরোদ।
তারে তারে দরদ,
অন্যরা চড় খান।



আলি আকবর খান



তবলা বাজান আল্লারাখা
তেনার সঙ্গে পাল্লা রাখা
সহজ ব্যাপার নয়।
পাশে বসে উনি কেটা ?
জাকির হোসেন বাপ-কা-বেটা,
চাটিতে নয় ছয়।

আল্লারাখা

এক চাঁদে রক্ষা নেই
এ যে ডবল 'মুন',
মায়ের মতই রূপবতী
মায়ের মতই গুণ।



মুনমুন সেন



বাংলাদেশের কুলপ্রদীপ
বাবা ডাকতেন জহর,
সেই জহরই আজ হয়েছে
আস্ত সোনার মোহর।
জ্যান্ত মেয়ে সামনে কাটে
শূন্যে মিলায় হাতি,
ফুসমন্তর যে-ই না বলা
কবুতর হয় ছাতি।
তাসের মেলা জলের খেলা
নানান ভোজের বাজি,
পয়সা দিয়ে রোজ ঠকতে
আমরা সবাই রাজি।
সন্দেহ হয় আজও বোধহয়
ঠকিয়েছে কবে
এই যে প্রদীপ নয় সে প্রদীপ
অন্য কেহ বসে।

পি সি সরকার (জুনিয়ার)

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তবাবুর
বাড়ি ছিল টাঙাইল,
চলন এবং বলন দেখে
কে বলবে বাঙাইল।



প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত



এইযে এলেন দেবী কানন
দেবীর মতোই প্রফুল্লানন।
আমরা বলি কাননদী
সব সময়ই আনন্দী।
মূর্খে বলে, তিনি তা নন।

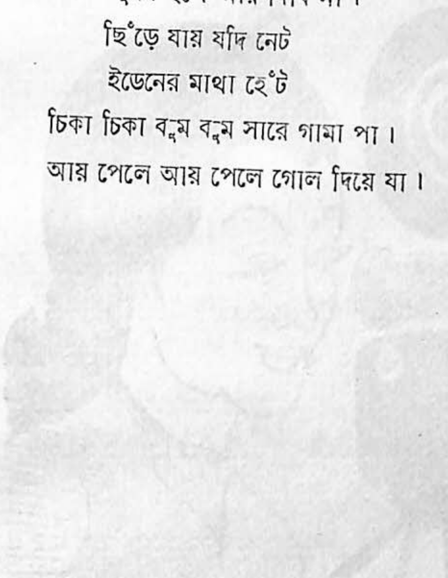
কানন দেবী



আয় পেলে আয় পেলে গোল দিয়ে যা,
কসমস মসমস হাঁটি হাঁটি পা।
কিক দিলে নাড়ু দেব
হেড় দিলে খাড়ু দেব
গোলের কপালে গোল, গোল দিয়ে যা।

আয় পেলে আয় পেলে ব্রাজিলের ছা,
ডলারে ফলার দেব যত খাবি খা।
পেলে বড় পেলেয়ার
কেলেসোনা খেলেয়াড়
এলেবেলে খেলে মুই হয়ে গেছি হাঁ।

আয় পেলে আয় পেলে মুখ তুলে চা'।
ডজন পূরণ হলে আর দিবি না।
ছিঁড়ে যায় যদি নেট
ইডেনের মাথা হেঁট
চিকা চিকা বুম বুম সারে গামা পা।
আয় পেলে আয় পেলে গোল দিয়ে যা।



পেলে

অপর্ণা সেন—
ছবি তুলেছেন
চৌরঙ্গি লেন।
সকলে কয়েছেন,
ভাল হয়েছেন।



অপর্ণা সেন



গদ্যে রাজা পদ্যে তাজা বসু তিনি বুদ্ধদেব,
বিয়ের পরে প্রতিভাবান
সব লেখাতেই অতি ভাবান
ভেবেও যদি কূল না মেলে তখন তিনি ক্রুদ্ধদেব ।

বুদ্ধদেব বসু

সুনীতি চাটুয্যে,—
বাক্য-চাতুর্য্যে
সব হ'ন হত।
ভাষাবিদ যত,
বয়সী হাঁটুর যে।



সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



বাবুর বাড়ি ময়মনসিং
গ্রামের নাম মসুয়া,
লেখেন তিনি আঁকেন তিনি
রসে রসে রসুয়া।
যেমন বাবা তেমন বেটা—
নিজেও তিনি কেউকেটা
তিন পুরুষে হ্যাট-ট্রিক,
অন্যে করে অসুয়া।

সুকুমার রায়

ছিলেন সাধু হলেন মন্ত্রী
মন্ত্রী থেকে সাধু,
দিল্লি ছেড়ে হরিদ্বার
যাদবপুরের দাদু।



ত্রিগুণা সেন



এক যে আছেন রাজকুমারী
রূপে গুণে সমান ঠিক
চোখ দুটি তাঁর গভীর অতল
রহস্যময় রোমান্টিক।
একটি যদি প্যাসিফিক তো
অন্যটিও আটল্যাণ্টিক।

সুচিত্রা সেন

রূপে তিনি কার্তিকেয়
যেন ছেলে উমার
অভিনয়ে সবার সেরা
তিনি উত্তমকুমার।



উত্তমকুমার



সোনার মেয়ে ঊষা,
মেডেল তোমার ভূষা।
চিতাবাঘের জাত,
দৌড়ে বাজিমাত।
সোনা জুড়ে জুড়ে
দেব দু'পা মুড়ে!

পি, টি, ঊষা

৩

বসন্ত চৌধুরী শুধু
অভিনেতা নন,
জমাচ্ছেন বহু টাকা,
সবই পুরাতন।



বসন্ত চৌধুরী



খেলার রাজা ক্রিকেট এবং
সুনীল রাজা ক্রিকেটের,
আজকে যদি শতক করেন
কালকে শতক করেন ফের।
রান পেরোলো দশ হাজার
মাথায় পরেন তাজ রাজার
বোলারেরা সেলাম জানায়,
রেকর্ড করেন রেকর্ডের।

সুনীল গাভাসকার

টপ্পা এবং পুরাতনী দুইটি পোষাপাখি,
বাগানবাড়ি ঠাকুরবাড়ি গলায় মাখামাখি।
প্রণয়গীতিই জমজমাটি ধর্মীয় গান কতক,
মুখ খুললেই এক পলকে হাজির গত শতক।
মিষ্টি হাসি শিষ্ট বচন তিনি রামের কুমার,
গালেতে পান মুখেতে গান কাণ্ড ধুন্ধুমার।



রামকুমার চট্টোপাধ্যায়



পাথরকোঁদা চেহারাখান রামকিঙ্কর বেজ,
ফুর্তি দিয়ে মূর্তি গড়েন দুহাতে খুব তেজ।
রোদ্রে ঘুরে শরীর টাটান
হাসি দিয়ে আকাশ ফাটান
শিবের মাথায় বসিয়ে দেন হনুমানের লেজ।

রামকিঙ্কর বেজ



বনের খবর লিখে ফেমাস
শ্রীবুদ্ধদেব গুহ।
জানোয়ারদের মারতে জানেন,
বানান শিকার-ব্যূহ।
পালালো বাঘ ভালুক বরা
'বুলবুলি' এক পড়ল ধরা
গান গেয়ে সে আরো ফেমাস
বিরাট মহীরুহ।
Gun ছেড়ে তাই গান ধরেছেন
শ্রীবুদ্ধদেব গুহ।

বুদ্ধদেব গুহ



গলায় চাদর গায়ে আতর বাবু নীহার রায়,
পঁচাত্তর পার করেও তাঁর বয়স পঁচিশ প্রায়।
ইতিহাসে দেন না ইতি
রবিবাবুর মধ্যে স্থিতি,
চিরজীবন যুবা থাকতে করেন কল্পকায়।

নীহাররঞ্জন রায়

গাইয়ে অশোকতরু
তাঁর আছে এক জরু।
গাইতে যখন যান
জরুর দিকে চান—
ভাবটা 'কেয়া করু'।
জরু আগলান স্বামী,
অশোক বলেন, 'আমি
ভয়ে থরুথরু।'



অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়



পায়ে যেমন বল ছোটে
মুখে তেমন খই ফোটে
ব্যানার্জি সে পি. কে.,
এখন তিনি খেলা শেখান
মাঠে নেমে কায়দা দেখান,
রঙ হয়নি ফিকে।

পি, কে, ব্যানার্জি



দেশের পরিত্রাতা
তিনি ভারতমাতা।
এমনি মোদের গুণ,
মাকে করলাম খুন—
লজ্জাতে হেঁট মাথা।

ইন্দিরা গান্ধী

চালাতাম প্লেন
চালাচ্ছি দেশ,
কেউ দেয় গাল
কেউ বলে, বেশ।
ব্যাপারটা 'আজিব,'
বললেন রাজীব।



রাজীব গান্ধী



বাবু জ্যোতি বসুর
বলুন তো কী কসুর ?
যে গাঁয়ে তাঁর বাড়ি,
সে গাঁয়েতেই শ্বশুর।

জ্যোতি বসু

শুনুন মোশাই,
চুনী গোঁসাই।
ফুটবল—কাম—
ক্রিকেটে নাম।
গুণীর গুণী,
সত্যি চুনি।



চুনী গোস্বামী

বাবু কেনেথ কাউন্ডা,
যতেক ডলার পাউন্ডা,
মারেন তাদের ডাউন্ডা,
ডাউন্ডা মেরে ঠাউন্ডা ।



কেনেথ কাউন্ডা



ওরে ও ভাই আজহারু,
খেলতে নেমেই তিনটি শতক
ব্যাপারটা খুব মজহারু

মহম্মদ আজাহারুদ্দিন

পেলের ছিল দশ নম্বর, তাঁরও জার্সি দশ,
পেলের চেয়ে খেলে ভাল, পায়ে ফুটবল বশ।
বলটা টেনে পেছন থেকে
যায় ছুটে সে এঁকেবেঁকে
ডাইনে বাঁয়ে সামনে মেরে মাঠে নামায় ধস।
প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভাঙে, গোলীর মাথা হেঁট,
লাইন পেরিয়ে বলের গোলা ছিঁড়ে ফেলল নেট।
কইরে আমার লক্ষ্মীসোনা
আয়রে আমার মারাদোনা,
বল ছুটছে তুই ছুটছিস—যেন বিমান জেট।



মারাদোনা

উচ্চ আশার বাবা মায়ের নিম্নমানের ছেলে,
ওপর দিকে তোলা হল অনেক ঠুলে ঠেলে।

তখন ছিল রোগা পটকা ওজন অনেক কম,
খ্যাংরাকাঠির মাথায় যেন আস্ত আলুর দম।

সেই আলুটা কুমড়ো হয়ে নেমে এল পেটে,
পাঞ্জাবিকে গোঁত্তা মেরে গেঞ্জিতে রয় সেঁটে।

সিলেট জেলার গাঁইয়া এল শান্তিনিকেতন,
চোখ ফুটল মুখ ফুটল রইল উচ্চারণ।

প্রজাপতির মত মেয়ে ঘুরে বেড়ায় ঢের,
তাদের ফেলে প্রেমে পড়ল রবি ঠাকুরের।

লেখাপড়া শিকেয় তুলে শিখল আড্ডা মারা,
ভালবাসল ভাল জিনিস, তবু ছন্নছাড়া।

হাস্য পেলেই হাস্য করে নৃত্য পেলেই নাচে,
লোকের পিছন লাগে তবু লোকরা আসে কাছে।

সাংবাদিকের কর্ম নিয়ে কলকাতায় এসে,
বীরভূম আর সিলেট মেশা গাঁইয়া গেল ফেঁসে।



তারপরে তার ঘোরাঘুরি সিঁড়ির পরে সিঁড়ি,
কপাল জোরে জুটে গেল খেতাব পদ্মশ্রী।

কিন্তু সকল কাজের ফাঁকে ছড়া লেখায় মন,
সেই কারণেই বই ছাপানোর পেল নিমন্ত্রণ।

স্বয়ং ছড়াকার

নামমাত্র

অমিতাভ চৌধুরী

